বাংলাদেশের মিলিটারীর পাকিস্তানাইজেশান প্রসঙ্গে

~ Faham Abdus Salam

ছোটো থেকেই আমি শুনে আসছি যে বাংলাদেশের মিলিটারী পাকিস্তানাইজড এবং এই পাকিস্তানাইজেশানের মূল কারিগর হোলো পাকিস্তান ফেরত সব অফিসার (যারা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে বন্দী ছিলেন) যদিও এদের মূল নেতা একজন মুক্তিযোদ্ধা (জিয়াউর রহমান)।

এই ব্যাপারটা আমি ছোটো বেলা থেকেই খুব গুরুত্বের সাথে খেয়াল করেছি যেহেতু আমার বাবা একজন পাকিস্তান ফেরত এয়ারফোর্স অফিসার ছিলেন (তিনি ৫০ এর দশকে এয়ার ফোর্সে জয়েন করেছিলেন - সে অনেক কাল আগের কথা)। যদিও তিনি মারা গেছেন আমার একদম ছেলেবেলায় কিন্তু তার বন্ধুবান্ধবদেরও আমি খেয়াল করেছি খুব মনোযোগ দিয়ে এবং আমার ধারণা এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি আমি জানি - কিছুটা হলেও।

প্রথমেই বলে রাখি এই যে এসার্শান যে পাকিস্তান-ফেরত অফিসাররা পাকিস্তান-পন্থী এর মধ্যে একটা হাস্যকর কনট্রাডিকশান আছে। আমার জানামতে এই পাকিস্তানপন্থী অফিসারদের কেউই কখনো প্রকাশ্যে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জানান নি কিন্তু তারা **সামষ্টিকভাবে** পাকিস্তান-পন্থী হয়ে গিয়েছেন অথচ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক/বুদ্ধিজীবী মহলে অনেকেই প্রকাশ্যে পাকিস্তানের গৌরব গাঁথা গেয়েছেন (যেমন আগাচৌ) কিংবা পাকিস্তানের অখণ্ডতা চেয়েছিলেন (যেমন ড: সাজ্জাদ)। সবার জানা আছে যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক/বুদ্ধিজীবীরা সামষ্টিকভাবে পাকিস্তান-পন্থী হয়ে যান নি।

এর সহজতম ব্যাখ্যা হোলো যারা লেখেন, বুদ্ধির চর্চা করেন, তারা নিজেদের আক্রমণ না করে "অন্যদের" আক্রমণ করবেন - এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন আমার কাছে মনে হয় সমস্যাটা আরো গভীরে - মূল কারণ: মানুষ নামক প্রাণীটির মনস্তত্ব না বুঝতে পারা। খোলাসা করি।

আমার মার কিছুদিন আগে এলেকট্রলাইট ইমব্যালেন্স হয়েছিলো। এলেকট্রলাইট ইমব্যালেন্স হলে স্মৃতি হারিয়ে যায়, অসংলগ্নতা বেড়ে যায়। আমি পরীক্ষা করার জন্য আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের স্মৃতি কি মা মনে করতে পারো? একটু ভেবে আমার মায়ের উত্তর, ক্লিফটন বীচে (করাচীর) তোমার বাবার সাথে বিয়ের পর পর প্রথম যেদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম।

আমার বাবার ফটোগ্রাফির শখ ছিলো। তিনি ৫০ এর দশকে বহু ছবি তুলেছিলেন। আমি লক্ষ্য করি তিনি নিজের কোন ছবিগুলোর বড় প্রিন্ট করেছিলেন।। পাসিং আউট প্যারেডের কোনো ছবি তিনি বড় করেন নি, প্রথম ককপিটে বসার ছবি তিনি বড় করেন নি কিন্তু মারীর একটা ল্যান্ডস্কেপের তিনি বড় প্রিন্ট করেছিলেন, আর বড় করেছিলেন স্কিং করছেন পাকিস্তানের কোনো এক বরফাচ্ছন্ন অংশে - সেই ছবি। ব্ল্যাক এন্ড ওয়াইট এ বরফের ছবি ভালো করে তোলা খুব কঠিন - এনসেল এডামসের জোন সিস্টেম বুঝতে হয়, যেটা আমার বাবা বুঝতেন না - শাদায় শাদাকার ছবি। স্বাভাবিক ভাবেই ছবিটা খুবই সাধারণ - বাজেও বলতে পারেন কিন্তু আমার বাবা ছবিখানা বড় করেছিলেন। বাইশ তেইশের তরুণ সৌন্দার্যাহত হওয়ার স্মৃতিটা কোনোভাবেই হারিয়ে ফেলতে চায় নি।

আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে সামরিক বাহিনীতে বাঙালি অফিসাররা যতোটা সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে কাটিয়েছিলেন এতো লম্বা সময় ধরে অন্য কোনো পেশার বাঙালিরা ওখানে থাকেন নি। আমার বাবারা তখন ২৫ বছরের তরুণ। কেউ বিয়ে করেছেন কেউ করেন নি। মোটর সাইকেল হাকিয়ে যে মেয়েটাকে এই তরুণেরা ইমপ্রেস করতে চাইছে তাদের অনেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী। তাদের সেখানে social interaction হয়েছে। একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক একজন পাকিস্তানীর সাথে না মিশেও বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছেন ঢাকায়। তার পক্ষে সকল পাকিস্তানীকে, পাকিস্তানের মাটি পানিকে, ইসলামাবাদকে ঘৃণা করা যতোটা সহজ, সামরিক বাহিনীর লোকজনের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিলো না। পশ্চিম পাকিস্তানে কি বাবারা খুশীতে বাকবাকুম ছিলেন? মোটেও না। বরং তারা বাঙালি হওয়- জনিত সামাজিক অবিচার যতোটা কাছ থেকে দেখেছেন অবস্থানগত কারণে অনেক ঝানু রাজনীতিবিদও তা দেখেন নি। আমার বাবাকে ইংল্যান্ডে একটা এক বছরের কোর্সে যাওয়ার দিন সকালে জানানো হয় যে তার বদলে এক পাকিস্তানী ছেলে যাচ্ছে। তবে খারাপ অভিজ্ঞতার সাথে কিছু ভালো অভিজ্ঞতাও তাদের হয়েছিলো - এটাই স্বাভাবিক - এরা সবাই মানুষ ছিলেন।

আমার বড় বোন হওয়ার সময়ে মার পাশে তার শাশুড়ি কিংবা মা ছিলেন না। ১৮ বছরের বাচ্চা একটা মেয়েকে মাতৃত্বের শিক্ষা দিয়েছিলেন এক বয়স্ক পাকিস্তানি অফিসারের ওয়াইফ। তার পক্ষে এই মহিলাটিকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। মা'র কাছে পাকিস্তানের জুনায়েদ জামশেদ (vital signs এর গায়ক, এখন তাবলীগ করেন) খুবই ভালো গায়ক - এজন্য না যে সে সত্যিই খুব ভালো গান গায়। বরং এজন্যে যে তাদের পারিবারিক বন্ধু জামশেদ ভাইয়ের এই ছেলেটিকে ছোটোবেলায় কোলে নিয়েছেন, বাসার সামনে খেলতে দেখেছেন। হুট করে কোনো ভুমিকা ছাড়া কেউ এসব পর্যবেক্ষণ করলে অনেকে বলে বসেন যে এসব পাকিস্তান প্রীতি। কিন্তু আসলে এর সাথে রাজনীতির কোনো সংস্রব নাই - একান্তই মানবিক ব্যাপার - আমার মা যদি সাবিনা ইয়াসমিনকে ছোটবেলায় এরকম কোলে নিতেন তার প্রতিও একটা বায়াস তৈরী হতো। আমার পক্ষে পাকিস্তানকে ঘৃণা করা, ইগনোর করা কোনো ব্যাপারই না - কারণ পাকিস্তানের সাথে আমার কোনো এনগেজমেন্ট নাই, ছিলও না। কিন্তু আমার বাবা-মা দের জন্য ব্যাপারটা এতো সহজ ছিলো না - তাদের সেখানে স্মৃতি ছিলো। ২৫ বছরের তরুণটি সৌন্দর্যাহত হয়ে যে ছবিটা তুলে বড় করেছিলো সেটা মারীর (আজকের মারী বস্তি কিন্তু ৫৮ সালে জায়গাটা সত্যিই অপূর্ব ছিলো) ছবি। তার পক্ষে যৌবনের সব স্মৃতি shift deleate করা এতো সহজ ছিলো না।

আজকে অস্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশের যদি কোনো যুদ্ধ হয় আমার পক্ষে কি সম্ভব হবে আমার সব অস্ট্রেলিয়ান বন্ধুকে রাতারাতি শত্রু ভেবে বসা, আমি কি ভুলতে পারবো বিয়ের পর শামার হাত ধরে অপেরা হাউজের সামনে হাটার সময় কতো স্বপ্ন দেখেছিলাম জীবনকে নিয়ে? আমার কাছে কি কোনো যন্ত্র আছে যা দিয়ে রাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়াকে ঘৃণা করা শিখে যাবো কিন্তু রাষ্ট্র ভিন্ন আর সব স্মৃতিকে ভরা যাবে সোনার খাঁচায়?

এর সম্পূর্ণ বিপরীত নক্সাটাও আমি দেখেছি। ৮০'র দশকে বাংলাদেশে পাকিস্তান হাই কমিশনে কাজ করতে আসা পরিবারের ছোটো মেয়েটা বাংলাদেশ সম্বন্ধে অজ্ঞান। হলিক্রসে পড়া মেয়েটি এই ধুলোবালি মাখা শহরটাকে কোনো বাংলাদেশির চেয়ে কম ভালোবাসে নি, তার কাছে স্কুলের সামনে আমড়া খাওয়ার আনন্দ কোনোমতেই ভুলে যাওয়ার না (পাকিস্তানে আমড়া হয় না)। আমার মার সাথে সে যখন বাংলাদেশ ছেড়ে আসার বিশ বছর পর বাংলায় কথা বলছিলো, বোঝার উপায় ছিলো না সে বাঙালি না উর্দুঅলা।

বাংলাদেশ আমলে যারা হুট করে সামরিক বাহিনীর কর্তা হয়ে বসলেন তারা আসলে বলতে গেলে সবাই ৩০ থেকে ৪০ বছরের তরুণ (৩৮ বছর বয়সে মেজর জেনারেল হয়ে যাচ্ছেন, হয়ে যাচ্ছেন এয়ার কমডোর)। এই বাচ্চা ছেলেরা নতুন দেশের নতুন সামরিক বাহিনীতে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের code of conduct তৈরী করবে কিংবা সম্পূর্ণ খোলনলচে বদলে নতুন গোছের professionalism তৈরী করবে - এটা এক অবাস্তব চিন্তা। এরা তাই করেছিলেন যা তারা শিখেছিলেন ক্যাডেট হিসেবে - ঠিক যেভাবে আমাদের পার্লামেন্টারী ট্র্যাডিশান বৃটেনের আদলে হাজির, ঠিক যে রকম ভারত ও পাকিস্তানের মিলিটারী কমান্ড বৃটেনের মতো গড়ে উঠেছিলো। কিন্তু ঘ্যান ঘ্যান করা বাঙালি ঘ্যানোরিস্তা বুদ্ধিজীবি শ্রেণী সামরিক অফিসারদের স্থান ও কালের প্রডাক্ট হিসেবে দেখতে চান নি - তারা ভেবেছিলেন হুট করে ৭২ এ এসে পুরো অতীত তারা ভুলে যাবেন এবং শুরু করবেন নতুন এক অধ্যায়।

মজার ব্যাপার হোলো, আমি আমার বাবার সহকর্মীদের মাঝে একজনকেও পাই নি যিনি পাকিস্তান নামক রাজনৈতিক ধারণাটির সাথে একমত, একজনকেও পাই নি যিনি বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাতে চেয়েছিলেন। হ্যা তাদের পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ একটা ছিলো; অনেকের এখনো আছে, শুক্রবারে তারা পাঞ্জাবি না পরে কাবলী পরতেন, মেহেদী হাসানকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গায়ক মনে করতেন অনেকেই কিন্তু সেই যোগাযোগের মানে এই না যে তারা চেতনা ও আকাঙ্ক্ষায় পাকিস্তানী। তাছাড়া পলিটিকাল পাকিস্তান একটা হেরে যাওয়া আইডিওলজি, জামাতের কিছু উন্মাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতা ছাড়া বাংলাদেশের কেউই আর পলিটিকাল পাকিস্তানে আগ্রহ বোধ করেন না। এমনটাই হওয়ার কথা ছিলো এবং এমনটাই হয়েছে। যদি ভেবে থাকেন রাজনীতিতে ইসলামের উপস্থিতি চাওয়াটা একটা "পাকিস্তানী" প্রবণতা তাহলে ভারতীয় উপমহাদেশের পলিটিকাল থটসের ইতিহাস বিষয়ে আপনার কোনো পড়ালেখা নেই। আমাদের রাজনীতিতে ইসলাম ও হিন্দুত্ববাদের উপস্থিতি ৪৭ এর বহু আগে থেকেই প্রবলভাবে রয়েছে।

দরকার ছিলো একটু সময়। এখনকার অফিসারদের মাঝে পাকিস্তানের সাথে প্রায় কোনো সংস্রবই আর অবশিষ্ট নাই। যেমনটা হওয়ার কথা ছিলো ঠিক তেমনই হয়েছে। কিন্তু ঘ্যানোরিস্তা ক্লাস যথারীতি পুরো ব্যপারটাকে এতোটাই তিক্ত করে ফেলেছে যে আমাদের নিজের দেশের সামরিক বাহিনীকে অন্য কিছু না - ঠিক শুনছেন - দেশপ্রেমের ব্যাপারে সন্দেহ করাটা আমরা ইন্টেলেকচুয়ালি ফ্যাশেনেবল বানাতে সক্ষম হয়েছি।

আমরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ সত্য পলিটিকাল কারেক্টনেসের চক্করে প্রায়ই ভুলে যাই যে আমাদের একটা সর্বভারতীয় চরিত্র, একটা সর্বভারতীয় মেমোরী আছে, এটা হাজার বছরের সংশ্লেষ এর ফলাফল - এটাকে চাইলেই আপনি মুছে ফেলতে পারবেন না - এটা একটা কালেকটিভ মেমোরী। এই উপমহাদেশের যেকোনো মানুষকে উপমহাদেশের যেকোনো স্থানে এনে ফেললে সে এলিয়েনেটেড হয়ে যায় না, বরং সে তার ভারতীয়তা উপলব্ধি করতে শেখে। এই সর্বভারতীয়তার কারণেই বাঙালি মুসলমান পাকিস্তানে গিয়ে ততোটা 'এলিয়েন' ফীল করে নাই যেটা আরবে গিয়ে করেছে, এই সর্বভারতীয়তার কারণেই বাংলাদেশে আমাদের পড়শী দক্ষিন ভারতের রাজু ভেঙ্কট ৮ বছর ধরে ছিলেন কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে অনেক বেশী টাকা আয় করেও বাংলাদেশেই ফিরে আসতে চাইছেন। ইসলাম, হিন্দুত্ব, শাড়ি, পাঞ্জাবি, রাগ-প্রধান গান, হিন্দি-উর্দু ভাষা, বিরিয়ানি, বাংলার রসগোল্লা, জিলাপী, রবীন্দ্রনাথ, লতা, নুসরাত ফতেহ আলী খান - এ সবই এই ভারতীয়তার উপাদান। এই ভারতীয়তাকে অস্বীকার করার মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই, মূর্খতা আছে।

আমাদের বুদ্ধিজীবিকুল এই সর্বভারতীয়তার শুধুমাত্র পলিটিকাল এক্সপ্রেশান নিয়ে এতোটাই ধন্ধে ছিলেন এবং আছেন যে একদল পাকিস্তান আরেক দল ভারতকে ঘৃণা করার মধ্য দিয়েই তাদের mojo ধরে রাখেন। সামাজিক সমস্যার তারা চান রাজনৈতিক সমাধান আর রাজনৈতিক সমস্যার আইনী সমাধান। মেধার অভাবকে তারা কমপেনসেট করেন কনভিকশন দিয়ে। এই আত্মঘাতী প্রবণতা দীর্ঘদিন চর্চা করার ফলাফল হয়েছে এই যে আমাদের তরুণেরা দেশে ভারতীয় আর পাকিস্তানীদের গাল দিয়ে বাহবা কুড়ায় কিন্তু সামনাসামনি কুকড়ে থাকে ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্সের কারণে। নিজেদের আমরা ওদের সমকক্ষ ভাবতে পারি না, কনফিডেন্সের অভাবে উপেক্ষাও করতে পারি না।

পাকিস্তান ও ভারতকে মনের মধ্যে অতি স্বাভাবিক ভাবে ধারণ করে আমার বাংলাদেশিত্বকে উদযাপন করবো - এই সহজ জিনিসটা আমাদের বুদ্ধিজীবিরা আমাদের শেখাতে পারেন নাই। যে কারণে একজন বলেছেন কোনো পাকিস্তানী যদি ফুল নিয়েও আসে তাকে অবিশ্বাস করতে হবে। এই যে আপনার প্রি-কনসিভড নোশন যে পাকিস্তানীদের ঘৃণা করতে হবে (ভারতীয়দের ঘৃণা করার জজবাও সমান জনপ্রিয়) - এটা কি বোঝেন যে এর মাধ্যমে আপনি তাদের অতিরিক্ত পাত্তা দেন? কোথায় আপনার I don't give a fuck মানসিকতা কিংবা কোথায় আপনার ঔদার্য, শিভলারী?

এই লাগামহীন সন্দেহের সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছে সামরিক বাহিনী। মনে হয় তাদের সমালোচনা করার বহু প্রসঙ্গ আছে কিন্তু এ নিরীখে সন্দেহ করাটা অন্যায়।